Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা নাহার শোভা

রোলঃ 23090120109


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা নাহার শোভা

রোলঃ 23090120109

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সানজিদা নাহার শোভা, আইডিঃ 23090120109 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Shova

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

**সানজিদা নাহার শোভা**

আইডিঃ 23090120109

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

ভূমিকা ........................................ 5
প্রথম অধ্যায় ........................................ 8
জিহাদের পরিচয় ........................................ 8
দ্বিতীয় অধ্যায় ........................................ 26
কুরআনের  আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ........................................ 26
তৃতীয় অধ্যায় ........................................ 31
হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ........................................ 32
চতুর্থ অধ্যায় ........................................ 37
জিহাদের নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ........................................ 38
পঞ্চম অধ্যায় ........................................ 47
জিহাদের অপব্যাখ্যা ও সঠিক ধারণা ........................................ 47
উপসংহার ........................................ 57

# ভূমিকা

১. ভূমিকার সূচনা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম শুধু ইবাদত বা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ন্যায়, শান্তি, মানবতা, এবং সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি। এই পরিপূর্ণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো জিহাদ— যা ইসলামী সমাজব্যবস্থার ন্যায়, সত্য ও নৈতিকতার ভিত্তি রক্ষার সংগ্রামকে নির্দেশ করে।

“জিহাদ” শব্দটি ইসলামি ইতিহাসে অত্যন্ত সম্মানজনক হলেও আধুনিক যুগে এটি নানা বিতর্ক ও ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতা ও অনেক গণমাধ্যমে জিহাদকে কেবল যুদ্ধ বা সহিংসতার প্রতিশব্দ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ বিকৃত ও একপাক্ষিক ধারণা। অথচ কোরআন ও হাদীসে জিহাদকে শুধু যুদ্ধ হিসেবে নয়, বরং আত্মসংযম, সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং মানবতার কল্যাণে আত্মনিবেদনের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন। তাঁর জীবন, দাওয়াতি কর্ম, ধৈর্য, নৈতিকতা, এবং যুদ্ধনীতি—সব ক্ষেত্রেই জিহাদের বহুমাত্রিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব, জিহাদ শুধু তরবারির যুদ্ধ নয়; এটি এক ধারাবাহিক আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক সংগ্রাম—যা ঈমানের অন্যতম প্রমাণ।

২. গবেষণার পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান যুগে “জিহাদ” শব্দটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বে অনেকেই “জিহাদ” শব্দটিকে “সন্ত্রাসবাদ” বা “ধর্মীয় চরমপন্থা”-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেখে, যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে অসঙ্গত। মুসলমানদের একাংশও কখনো কখনো রাজনৈতিক স্বার্থে জিহাদের অপব্যাখ্যা করেছে, ফলে বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে কোরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের প্রকৃত ধারণা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পুনরায় বিশ্লেষণ করা আজ অপরিহার্য। কারণ, ইসলামি সমাজে ন্যায়বিচার, মানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় জিহাদের মূল শিক্ষা অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করে। কোরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে—

> “তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করার অধিকার রয়েছে তাঁর।” (সূরা হজ্জ:স্ত৭৮)

*অতএব, জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝা কেবল একটি ধর্মীয় প্রয়োজন নয়, বরং এটি মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও নৈতিক পুনর্জাগরণের পূর্বশর্ত।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে জিহাদের প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা। বিশেষভাবে গবেষণার লক্ষ্যসমূহ হলো:

✓.জিহাদের ভাষাগত ও পরিভাষাগত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা।

✓. কোরআন ও হাদীসে জিহাদের স্থান, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা।

✓. জিহাদের নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক দিক তুলে ধরা।

✓. আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা।

✓. ইসলামি সমাজে জিহাদের শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক প্রয়োগের পথ নির্দেশ করা।

✓.অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

✓.মানবজাতির মুক্তি ও প্রতিহিংসা রোধ।

✓. স্ব-সংযম ও নৈতিক উন্নয়ন (جِهاد النَّفْس):নিজের নফস, ইচ্ছা ও বাইরের প্রলোভনকে নিয়ন্ত্রণ

✓. অপরাধ ও অনৈতিকতার প্রতিরোধ।

✓. সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

✓. শান্তি প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষা:জিহাদ কখনোই অকারণে সহিংসতা নয়—প্রয়োজনে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করে স্থিতিশীল শান্তি অর্জন করা।

✓. উম্মাহর ঐক্য রক্ষা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

৪. গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

জিহাদ ইসলামের এমন এক শিক্ষা, যা মানবসমাজে ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আধুনিক যুগে এর বিকৃত ব্যাখ্যা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেছে এবং অমুসলিম বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। তাই কোরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের প্রকৃত ধারণা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি।

এই গবেষণার মাধ্যমে পাঠক বুঝতে পারবেন, জিহাদ আসলে কোনো রক্তপাত বা সহিংসতার নির্দেশ নয়; বরং এটি আত্মসংযম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এবং মানবতার সুরক্ষার এক মহান সংগ্রাম। ইসলামের এই প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরলে ইসলামফোবিয়া ও ভুল ধারণা দূর হবে, এবং মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও জিহাদের ইতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ এই গবেষণাকে সমসাময়িক ও প্রাসঙ্গিক করে তুলবে।

# প্রথম অধ্যায়

## জিহাদের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

জিহাদ (جهاد) আরবী শব্দ: মূল রূট হলো جهد (jahada) — যার সাধারণ অর্থ হচ্ছে 'শ্রম করা', 'প্রচেষ্টা', 'কষ্ট করা' বা 'পরিশ্রমে লিপ্ত হওয়া'। ভাষাগত অর্থে জিহাদ মানে হলো কঠোর প্রয়াস বা পরিশ্রম; আর পরিভাষাগত (ইসলামিক) অর্থে জিহাদ বোঝায় অধম, অনাচার ও বন্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আল্লাহর পথে আত্মনিয়োগ।

ইসলামিক সাহিত্য ও ফিকহ-সাহিত্যে জিহাদকে সাধারণত বিস্তৃতভাবে ধরা হয়—এর মধ্যে আছে জিহাদুন নফ্স (নফসের বিরুদ্ধে লড়াই), কলমের জিহাদ (জ্ঞান ও দাওয়াহ দ্বারা সংগ্রাম), সামাজিক-রাজনৈতিক জিহাদ (অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠা) এবং সীমাবদ্ধ ও শর্তসাপেক্ষ সামরিক জিহাদ (কিতাল)। কোরআন ও সুনাহতে জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসগুলো প্রায়ই বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে; তাই জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে পাঠ্যভিত্তিক প্রেক্ষাপট ও শর্তসমূহ বিবেচনায় রাখতে হয়।

জিহাদের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো — (১) এটি নৈতিক ও ঈমানভিত্তিক অনুশাসন; (২) এর উদ্দেশ্য মূলত ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অত্যাচার প্রতিহত করা ও মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা; (৩) এটি সবসময় শর্তসাপেক্ষ ও নিয়ন্ত্রিত—অর্থাৎ ইসলামি নীতিমালা ও যুদ্ধবিধি, নিরীহদের প্রতি সহমর্মিতা এবং আক্রমণের প্রতিশোধ নয়, প্রতিরক্ষা ও ন্যায়ের আধারে সীমাবদ্ধ; এবং (৪) এটি কেবল বাহ্যিক যুদ্ধ নয়, বরং অন্তর্লীণ আত্মসংযম ও সমাজসংস্কারের জন্য ধারাবাহিক সংগ্রামও।

জিহাদের শাব্দিক অর্থ

"জিহাদ (جهاد)" শব্দটি আরবি ক্রিয়াধাতু "جَهَدَ – يَجْهَدُ – جُهْدًا / جِهَادًا" থেকে উদ্ভূত, যার মূল অর্থ হলো —

- 'পরিশ্রম করা',
- 'শ্রম বা চেষ্টা করা',
- 'সর্বশক্তি প্রয়োগ করা',

-‘কোনো কষ্ট বা বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা’।

অর্থাৎ, শাব্দিকভাবে জিহাদ মানে হলো নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে কোনো উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টা করা।
আরবিতে “জাহদ (جهد)” বা “মুজাহাদা (مجاهدة)” শব্দগুলোও একই উৎস থেকে এসেছে, যা ‘প্রচেষ্টা’ বা ‘সংগ্রাম’-এর ধারণা প্রকাশ করে।

*কোরআনে “জিহাদ” শব্দটি প্রায় ৩০ বারের বেশি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে — কখনো আত্মিক সংগ্রাম, কখনো সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, আবার কখনো আল্লাহর পথে যুদ্ধের অর্থে।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

“যারা আমার পথে জিহাদ করে (সংগ্রাম করে), অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।”

(সূরা আনকাবুত ২৯:৬৯)
এই আয়াতে “জিহাদ” বলতে বাহ্যিক যুদ্ধ নয়; বরং আত্মিক ও নৈতিক প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয়েছে — অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সংগ্রাম।

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ হলো -
“আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দীনের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করা।”

আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে —
জিহাদ হলো আল্লাহর পথে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মা, সম্পদ, মন, জ্ঞান, কলম, এবং প্রয়োজনে অস্ত্রের মাধ্যমে সংগ্রাম করা।

ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী (রহঃ) বলেন:

الجِهَادُ: بَذْلُ الجُهْدِ فِي مُقَاوَمَةِ العَدُوِّ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ

অর্থ: “জিহাদ হলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করা।”
(মুফরাদাত আল-ইসফাহানী)

*অতএব, ইসলামি শরিয়তে জিহাদ কেবল যুদ্ধ নয়; বরং এটি একটি বিস্তৃত ধর্মীয় ও নৈতিক কার্যক্রম, যা অন্তর্ভুক্ত করে—

✓নিজের নফস ও কামনার বিরুদ্ধে আত্মসংযম (جهاد النفس),
✓জ্ঞানের মাধ্যমে সত্য প্রচার (جهاد بالعلم),
✓সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (جهاد باللسان أو بالقلم),
✓এবং প্রয়োজনে ইসলামের নিরাপত্তা ও মানবতার প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ (جهاد بالسيف)।

জিহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা

*ভাষাগত সংজ্ঞা*

আরবি ব্যাকরণে “জিহাদ (جهاد)” শব্দটি এসেছে “জাহাদা” (جَهَدَ) ধাতু থেকে, যার অর্থ —

بَذْلُ الجُهْدِ وَالطَّاقَةِ فِي فِعْلٍ مَا
অর্থ: “কোনো কাজ সম্পাদনে সর্বশক্তি ও পরিশ্রম ব্যয় করা।”

অর্থাৎ, শাব্দিকভাবে জিহাদ মানে হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সামর্থ্য প্রয়োগ করা, তা হোক আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা শারীরিক।

*শরয়ি বা পারিভাষিক সংজ্ঞা*

(ক) ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী (رَاغِب الأصفهاني) বলেন —

الجِهَادُ: بَذْلُ الوُسْعِ فِي مُقَاوَمَةِ العَدُوِّ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ

অর্থ: “জিহাদ হলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করা।”

(সূত্র: المفردات في غريب القرآن)

**ব্যাখ্যা**: এখানে “বাহ্যিক শত্রু” বলতে শত্রুমনা শক্তিকে বোঝানো হয়েছে, আর “অভ্যন্তরীণ শত্রু” বলতে নিজের নফস ও শয়তানের প্ররোচনাকে বোঝানো হয়েছে।

(খ) ইমাম ইবনুল কায়্যিম (ابن القيم) বলেন —

الجِهَادُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: جِهَادُ النَّفْسِ، وَجِهَادُ الشَّيْطَانِ، وَجِهَادُ الْكُفَّارِ، وَجِهَادُ الْمُنَافِقِينَ

অর্থ: “জিহাদ চার প্রকার—নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ।”

(সূত্র: ইবনুল কায়্যিম, জাদুল মাআদ)

**ব্যাখ্যা:** এই সংজ্ঞা জিহাদের ব্যাপকতা নির্দেশ করে; যা কেবল যুদ্ধ নয়, বরং আত্মশুদ্ধি ও আদর্শিক সংগ্রামকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

(গ) ইমাম নববী (الإمام النووي) বলেন —

الجِهَادُ هُوَ القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ

অর্থ: “জিহাদ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর কালিমা সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করা।”

(সূত্র: শরহ সহীহ মুসলিম)

**ব্যাখ্যা:**নববী (রহ.)-এর সংজ্ঞা মূলত “কিতাল” বা সামরিক জিহাদের দিকে ইঙ্গিত করে, যা ইসলামী আইনে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ফরজ হয়।

(ঘ) ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাজী (الفخر الرازي) বলেন —

الجِهَادُ هُوَ مُبَالَغَةُ الاِجْتِهَادِ فِي إِقَامَةِ الدِّينِ وَدَفْعِ الْبَاطِلِ

অর্থ: "জিহাদ হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও বাতিল শক্তিকে প্রতিহত করতে পরম প্রচেষ্টা।"
(সূত্র: তাফসীর আল-কবীর)

**ব্যাখ্যা:**এই সংজ্ঞায় জিহাদকে নৈতিক ও আদর্শিক সংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

(ঙ) আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীসে পাওয়া সংজ্ঞা

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ

অর্থ: "সর্বোত্তম জিহাদ হলো মানুষের নিজের নফস ও কামনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।"
(সূত্র: মুসনাদ আহমদ, ২৩৪৫)

**ব্যাখ্যা:**এখানে নবী ﷺ আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধিকেই জিহাদের শ্রেষ্ঠ রূপ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

(চ) ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাস (أبو بكر الجصاص) বলেন —

الجِهَادُ هُوَ الدِّفَاعُ عَنْ دِينِ اللهِ وَعِبَادِهِ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْقُوَّةِ وَالطَّاقَةِ

অর্থ: "জিহাদ হলো আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর বান্দাদের রক্ষায় সর্বশক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ।"
(সূত্র: আহকামুল কুরআন)

**ব্যাখ্যা:**এই সংজ্ঞায় প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের ধারণা উঠে এসেছে, যা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

*সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাবিদদের সংজ্ঞা*

(ক) সাইয়্যেদ কুতুব (Sayyid Qutb) বলেন —

> “জিহাদ কেবল অস্ত্রের যুদ্ধ নয়; এটি মানব সমাজে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার এক অবিরাম প্রচেষ্টা, যেখানে মানুষকে জুলুম ও শোষণ থেকে মুক্ত করা হয়।”
(সূত্র: ফি জিলালিল কুরআন)

(খ) আবুল আলা মওদূদী বলেন —

> “জিহাদ হলো আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অবিচারের শাসন দূর করার জন্য মুসলমানদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।”
(সূত্র: আল-জিহাদ ফি-ইসলাম)

(গ) ইমাম ইউসুফ আল-ক্বারদাবী বলেন —

> “জিহাদ হলো সত্য প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার রক্ষা, এবং আল্লাহর নির্দেশে মানবমুক্তির সংগ্রাম।”
(সূত্র: ফিকহুল জিহাদ)

জিহাদের প্রকারভেদ

ইসলামী শরীয়তের আলোকে জিহাদকে সাধারণভাবে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় —
১.জিহাদে আকবর (الأكبر)
২. জিহাদে আসগর (الأصغر)

*এবং বিশদভাবে চারটি বা পাঁচটি উপধারায় ভাগ করা হয়, যেগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

*১. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (جِهَادُ النَّفْس)*

সংজ্ঞা:
নিজের অন্তরের প্রবৃত্তি, খারাপ চিন্তা, কামনা-বাসনা, অলসতা ও পাপের প্রতি ঝোঁক—এসবের বিরুদ্ধে আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির জন্য লড়াই করাকে নফসের জিহাদ বলা হয়।

কোরআনের দৃষ্টিতে:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

“যারা আমার পথে জিহাদ করে (সংগ্রাম করে), আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।”
(সূরা আনকাবুত, ২৯:৬৯)

হাদীস:

﴿أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো মানুষ নিজের নফস ও কামনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।”
(মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ২৩৪৫)

উদ্দেশ্য: আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন, ও আল্লাহভীরুতা প্রতিষ্ঠা।

*২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ (جِهَادُ الشَّيْطَانِ)*

সংজ্ঞা:
শয়তানের কুমন্ত্রণা, সন্দেহ, ও পাপের আহ্বানকে প্রতিহত করে ঈমান, ইখলাস ও আল্লাহভক্তির মাধ্যমে তাকে পরাজিত করার সংগ্রাম।

কোরআনের দৃষ্টিতে:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

“নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর।”
(সূরা ফাতির, ৩৫:৬)

*উদ্দেশ্য: শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অটল থাকা।

*৩. কলম, জ্ঞান ও দাওয়াতের মাধ্যমে জিহাদ (جِهَادُ بِالْعِلْمِ وَالْقَلَمِ وَالدَّعْوَةِ)*

সংজ্ঞা:

ইসলামের সত্য বার্তা প্রচার করা, জ্ঞানের মাধ্যমে মিথ্যা মতাদর্শ ও অপপ্রচার খণ্ডন করা, এবং আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করাই এ জিহাদের মূল উদ্দেশ্য।

কোরআনের দৃষ্টিতে:

وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"তুমি কোরআনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে মহান জিহাদ কর।"

(সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৫২)

* এখানে "জিহাদে কাবিরা" অর্থাৎ "বৃহৎ জিহাদ" বলতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও দাওয়াতমূলক সংগ্রাম বোঝানো হয়েছে।

*উদ্দেশ্য: সমাজে সত্য, জ্ঞান ও ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা, এবং ইসলামকে বিকৃত ধারণা থেকে রক্ষা করা।

*৪. সমাজ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ (جِهَادُ بِالْكَلِمَةِ وَالْعَدْلِ)*

সংজ্ঞা:

অন্যায়, জুলুম, দুর্নীতি, ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা, ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।

হাদীস:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৪৩৪৪)

উদ্দেশ্য: সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা।

*৫. সামরিক বা যুদ্ধজিহাদ (جِهَادُ بِالسَّيْفِ / القِتَالُ فِي سَبِيلِ الله)*

সংজ্ঞা:
ইসলামের শত্রুদের আক্রমণ বা দমন নীতির প্রতিক্রিয়ায় আল্লাহর পথে অস্ত্রধারণ করে প্রতিরক্ষা বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা।

কোরআনের দৃষ্টিতে:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
"তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না।"
(সূরা আল-বাকারা, ২:১৯০)

**শর্তাবলী**

✓অন্যায় আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে হতে হবে,
✓নিরীহ জনগণের ক্ষতি করা যাবে না,
✓যুদ্ধের লক্ষ্য লুটপাট বা দখল নয়, বরং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা,
✓শত্রুর আত্মসমর্পণ বা শান্তির প্রস্তাব এলে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

উদ্দেশ্য: মুসলিম সমাজের নিরাপত্তা রক্ষা, অন্যায়ের প্রতিরোধ, এবং মানবতার মুক্তি।

*৬. অর্থ ও সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ (جِهَادُ بِالْمَال)*

সংজ্ঞা:
ইসলামের দাওয়াত, সমাজকল্যাণ, দরিদ্রদের সাহায্য, ও আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে অর্থের জিহাদ বলা হয়।

কোরআনের দৃষ্টিতে:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"তোমরা হালকা বা ভারী যেভাবেই হও না কেন বের হয়ে পড়ো, এবং তোমাদের সম্পদ ও প্রাণের দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ কর।"
(সূরা আত-তাওবা, ৯:৪১)

উদ্দেশ্য: ইসলাম ও সমাজের সেবা এবং মানবিক দায়িত্ব পালন।

*৭. কলম ও মিডিয়ার মাধ্যমে আধুনিক জিহাদ*

আধুনিক যুগে কলম, গবেষণা, মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সত্য প্রচার এবং ইসলামবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জ্ঞানভিত্তিক প্রতিরোধকেও জিহাদের সমসাময়িক রূপ বলা হয়। এটি আজকের দাওয়াতি দায়িত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের হুকুম

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জিহাদের হুকুম বা আইন একক নয়; বরং তা পরিস্থিতি, উদ্দেশ্য, আক্রমণ-প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্রীয় আদেশ, এবং মুসলিম সমাজের অবস্থার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। কুরআন ও হাদীস জিহাদের জন্য স্পষ্ট এবং সুসংহত বিধান নির্ধারণ করেছে, যাতে যুদ্ধ বা সংগ্রাম কখন বৈধ, কখন নিষেধ, আর কখন আবশ্যক তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

*১. জিহাদের মূল হুকুম: ফরয কিফায়া*

সাধারণভাবে জিহাদের (বিশেষত সামরিক জিহাদ) মূল বিধান ফরয কিফায়া— অর্থাৎ মুসলিম সমাজের একাংশ তা পালন করলে বাকিদের থেকে দায় মুক্ত হয়। আলেমদের সর্বসম্মত মত (ইজমা) অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রয়োজন, সীমান্ত রক্ষা, এবং উম্মাহর নিরাপত্তার জন্য সামরিক জিহাদ ফরয কিফায়া।

কুরআনের প্রমাণ

" حلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم"...ْ
— (সূরা তাওবা: ১২২)
এই আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, সবাই জিহাদে বের হবে না; বরং কেউ থাকবে, কেউ যাবে। এটি ফরয কিফায়ার প্রমাণ।

*২. আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা জিহাদ: ফরয আইন*

যখন শত্রু মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ করে, তখন জিহাদ ফরয আইন হয়ে যায়— অর্থাৎ প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের উপর আবশ্যক।

কুরআনের দলিল

" حوَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم"ْ
“যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো।”
— (সূরা বাকারা: ১৯০)

এই আয়াতে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বাধ্যতামূলক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

*৩. নির্যাতিত মুসলিমদের রক্ষা করা: ফরয আইন*

যদি কোনো জাতি মুসলিম নারী–পুরুষকে নির্যাতন করে, বন্দী করে, বা কষ্ট দেয়, এবং মুসলমানদের পক্ষে বাঁচানো সম্ভব হয়, তখন তাদেরকে উদ্ধারের জিহাদ ফরয আইন হয়ে যায়।

কুরআনের দলিল

" حوَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ"...َ
“তোমরা কেন যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং সেই নির্যাতিতদের জন্য...?”
— (সূরা নিসা: ৭৫)

*এই আয়াতে স্পষ্ট—অত্যাচারিতদের মুক্তি জিহাদের কারণ।

*৪. অত্যাচার প্রতিরোধ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও শান্তি রক্ষা: বৈধ জিহাদ*

কুরআন জুলুম ও অত্যাচার প্রতিরোধকে জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে।

দলিল

" حوَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْض"ُ
“মানুষের একদলকে অপর দলের দ্বারা আল্লাহ বাধা সৃষ্টি না করলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।”
— (সূরা বাকারা: ২৫১)

*এটি প্রমাণ করে যে, যুদ্ধ কখনো কখনো শান্তি ও ন্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয়।

*৫. যুদ্ধ শুরু করার শর্তসমূহ (ইসলামের কঠোর বিধান)*

জিহাদকে বৈধ করতে কুরআন ও হাদীস কয়েকটি শর্ত দিয়েছে:

✓যুদ্ধ অবশ্যই আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হতে হবে

ইসলাম নিজে থেকে যুদ্ধ শুরু করতে বলে না।

> "وَلَا تَعْتَدُوا" – “তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।”
— (বাকারা: ১৯০)

✓ নিরীহ মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ

নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় নেতা, কৃষক, শ্রমিক – কারো উপর আঘাত নিষেধ।

হাদীস:
> “নারী, শিশু এবং শ্রমিককে হত্যা করো না।” — (ইবনে মাজাহ)

✓ চুক্তিভঙ্গ নিষিদ্ধ

যাদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি আছে তাদের আঘাত করা হারাম।

" حوَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ"ِ
— (ইসরা: ৩৪)
✓ সম্পদ লুট, প্রতিশোধ, বা জাতিগত উদ্দেশ্য হারাম

জিহাদের উদ্দেশ্য নৈতিক, নয়ত রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত নয়।

*৬. হাদীসের আলোকে জিহাদের হুকুম*

✓ জিহাদ ঈমানের উচ্চতম স্তর

> “ইসলামের শীর্ষস্থান হলো জিহাদ।”
— (তিরমিজি)

✓ জিহাদ শুধু যুদ্ধ নয়

হাদীস জিহাদকে বহু শ্রেণিতে ভাগ করেছে:

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

সত্য কথা বলা

দাওয়াত ও জ্ঞান দিয়ে সংগ্রাম

সমাজ সংস্কার

✓ প্রতিরক্ষা জিহাদ আবশ্যক

> “যে ব্যক্তি নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলো, সে শহীদ।”
— (আবু দাউদ)

*এতে বোঝা যায় প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির বৈধ অধিকার।

*৭. শান্তি প্রতিষ্ঠা জিহাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য*

কুরআন বারবার বলেছে—যদি শত্রু শান্তির দিকে আগায়, মুসলিমদেরও যুদ্ধ থামাতে হবে।

" حوَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا"

“যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তুমি শান্তি গ্রহণ কর।”
— (সূরা আনফাল: ৬১)

*এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয়— শান্তি প্রতিষ্ঠাই মূল লক্ষ্য।

জিহাদ ও কিতালের পার্থক্য

ইসলামী শরীয়তের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হলো জিহাদ এবং কিতাল। অনেক সময় সাধারণ মানুষের কাছে এই দুটো শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও কুরআন, হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে এদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

*১. শব্দগত (শাব্দিক) পার্থক্য*

Δ জিহাদ (جهاد)

শব্দমূল: “জ-হ-দ”
অর্থ: পরিশ্রম করা, চেষ্টা করা, সংগ্রাম করা, কষ্ট সহ্য করা, সাধনা করা।
*অর্থাৎ জিহাদ হলো যেকোনো ধরনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা শারীরিক সংগ্রাম।

Δ কিতাল (قتال)

শব্দমূল: “ক-ত-ল”
অর্থ: যুদ্ধ করা, লড়াই করা, অস্ত্রধারণ করে মোকাবিলা করা।
*অর্থাৎ কিতাল হলো অস্ত্রসজ্জিত যুদ্ধ, যেটি দুই পক্ষের সংঘর্ষকে নির্দেশ করে।

*২. পারিভাষিক (ইসলামি শাস্ত্রীয়) পার্থক্য*

Δ জিহাদ – বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক ধারণা

ফিকহশাস্ত্রে জিহাদ বলতে বোঝায়

> ইসলামের সঠিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, সত্য প্রতিষ্ঠা, ন্যায় রক্ষা এবং মন্দ দমন করার জন্য সকল ধরনের সংগ্রাম।

এর আওতায় পড়ে:

✓নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
✓শয়তানের প্ররোচনা প্রতিহত করা
✓দাওয়াত ও কলমের মাধ্যমে সত্য প্রচার
✓সামাজিক সংস্কার
✓নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা
✓অর্থের মাধ্যমে সহায়তা
✓এবং সর্বশেষে সামরিক প্রতিরক্ষা জিহাদ

Δ কিতাল – জিহাদের শুধু সামরিক অংশ

কিতাল বলতে বোঝায়—

> শারীরিক অস্ত্রসজ্জিত যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘর্ষ, প্রতিরক্ষা বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ (শরিয়ত নির্ধারিত শর্তে)।

*এটি জিহাদের একটি অংশমাত্র; পুরো জিহাদ নয়।

*৩. কুরআনের দৃষ্টিতে পার্থক্য*

কুরআনে দুটি শব্দ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবহৃত হয়েছে:

Δ জিহাদ: নানামুখী অর্থে ব্যবহৃত

﴿وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“তুমি কুরআনের মাধ্যমে তাদের সাথে মহান জিহাদ কর।”
(ফুরকান: ৫২)

*এখানে যুদ্ধ নয়, দাওয়াত ও যুক্তিতর্ক বোঝানো হয়েছে।

∆কিতাল: কেবল যুদ্ধ বোঝায়

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

"যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।"
(বাকারা: ১৯০)
এখানে সরাসরি যুদ্ধ (battle) বোঝাচ্ছে।

*৪. হাদীসের দৃষ্টিতে পার্থক্য*

হাদীসে জিহাদ শব্দটি বহু অর্থে এসেছে:

✓নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ
✓সত্য কথা বলা
✓জ্ঞান দিয়ে সংগ্রাম
✓সৎকাজে ধৈর্য
✓এবং অস্ত্রসজ্জিত যুদ্ধ

কিন্তু কিতাল কেবল যুদ্ধ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

*৫. বিধানগত পার্থক্য (ফিকহ)*

∆জিহাদ

সাধারণভাবে ফরয কিফায়া,

কখনো ফরয আইন (যেমন শত্রুর আক্রমণ),

কখনো মুস্তাহাব (আত্মসংযমের জিহাদ),

কখনো ওয়াজিব (সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো)।

∆ কিতাল

✓সর্বদা নির্দিষ্ট শর্তে বৈধ
✓অনুমতি, নেতৃত্ব ও নিয়ম ছাড়া কিতাল বৈধ নয়
✓নিরীহ মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ
✓আক্রমণাত্মক যুদ্ধ কেবল রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত

*৭. সংক্ষেপে মূল পার্থক্য*

জিহাদ = বিস্তৃত বহুমাত্রিক সংগ্রাম
কিতাল = অস্ত্রসজ্জিত যুদ্ধ (জিহাদের একটি অংশ)

প্রতিটি কিতাল জিহাদ হতে পারে, কিন্তু প্রতিটি জিহাদ কিতাল নয়।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## কুরআনের  আলোকে জিহাদের গুরুত্ব

কুরআনের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব

মানবতার চরম দুর্দিনে যখন আশরাফুল মাখলুকাত তার মর্যাদার আসন থেকে ছিটকে পড়ে মূল্যহীন পশুরমত অবহেলিত, উপেক্ষিত, অপমানিত ও নির্যাতিত। অসহায় মানবতার বুকফাটা আরজি শ্রবণেরমত কেউ নেই। সকলেই জড়বাদ, বস্তুবাদ ও ভোগবাদের মরফিয়া পান করে বেহুঁশ, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, আত্মবিস্মৃত মানবতার এ করুণ সংকটময় মুহূর্তে আশরাফুল মাখলুকাতকে বিভ্রান্তির অতলগহ্বর থেকে মুক্ত করে স্বস্থানে উন্নীত করতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা অসীম কৃপায় নাযিল করেছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন। যার প্রতিটি পারায় পারায় আলোচনা হয়েছে, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার একমাত্র ইবাদাত জিহাদ ফী সাবীল্লিল্লাহ সম্পর্কে।পবিত্র কালামেপাকে জিহাদের এতঅধিক আলোচনা হয়েছে যে, প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরীনে কিরাম উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয়ই হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কালামে পাকের একশত পাঁচ স্থানে আদেশসূচক বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং অর্ধসহস্রাধিক আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জিহাদী আলোচনার অধিকাংশ স্থানেই ঈমানদারদের জিহাদী আমলের প্রতি ফযীলত বর্ণনার মাধ্যমে উৎসাহিত করেছেন। পর্যায়ক্রমে তারই কিছু আয়াত নিম্নে তুলে ধরা হলো-

মহা প্রতাপশালী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম উম্মাহকে মহাগ্রন্থ
আল-কুরআনে আদেশ করেছেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ◌َ

তোমাদের উপর ক্বিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) ফরয করা হয়েছে, যদিও তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয়। তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটি বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়; অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। (বাক্বারা- ২১৬)

ঈমানের পর মুসলমানদের উপর নামায! রোযা, হজ্ব, যাকাত যেমন ফরয, ক্বিতাল-ফী সাবীলিল্লাহও তেমনই একটি ফরয। বরং অনেক ক্ষেত্রে নামায-রোযার চেয়েও ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ অধিক জরুরী। তাই আল্লাহ তা'আলাও কুরআন পাকে ক্বিতালের (সশস্ত্র যুদ্ধ) বর্ণনা নামায-রোযার চেয়ে অধিক পরিমাণে করেছেন এবং ক্বিতালের প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত করার জন্য প্রিয় হাবীব (সাঃ) কে আদেশ করেছেন-

ইরশাদ হচ্ছে-

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِيضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে ক্বিতালের প্রতি উৎসাহিত করুন। (আনফাল- ৬৫ )এভাবে আয়াত নাযিলের মাধ্যমে অন্য কোন আমলের প্রতি উৎসাহিত করার আদেশ করা হয়নি।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-
فَقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفُ بأسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

আপনি আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে থাকুন। আপনি নিজের সত্ত্বা ব্যাতীত অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন। আর আপনি মুমিনদেরকে ক্বিতালের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দিবেন আর আল্লাহ শক্তি সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।
(-সূরা নিসা- ৮৪)

ক্বিতালের (সশস্ত্র যুদ্ধ) খুটি-নাটি প্রতিটি বিষয়ই কুরআনের আয়াত দ্বারা ফরয করা হয়েছে। ক্বিতালের প্রস্তুতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوٌّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخَرِينَ مِنْ كَوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

তোমরা নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং পালিত ঘোড়া দ্বারা, যাতে তোমরা আতংকিত করতে পার আল্লাহর দুশমন, তোমাদের দুশমনদের উপর তাছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জাননা; আল্লাহ জানেন।

-(আনফালঃ ৬০)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

ولو ارادوا الخروج الاعدوا له عدة

যদি তারা জিহাদে বের হওয়ার সংকল্প করত, তাহলে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম(যুদ্ধাস্ত্র) প্রস্তুত করত। -(তাওবা: ৬৫)

দুনিয়ার সর্বত্র অবাধ্য কাফেরদেরকে হত্যার আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

فاقتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مصد

পৃথিবীর যেখানেই মুশরিকদের পাও, সেখানেই তাদেরকে হত্যা কর, বন্দী কর, অবরোধ কর। আর প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাক।
-(তাওবা-৫)

আহলে কিতাবদের হত্যার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَوْ تَوَ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغرون

তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। (তাওবা- ৯২)

মুশরিকদের হত্যার আদেশ দিয়ে বলেন-

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

মুশরিকদের সাথে তোমরা সশস্ত্র যুদ্ধ কর সমবেতভাবে- যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সমবেতভাবে। আর মনে রেখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। -(তাওবাহ: ৩৬)

নিকটবর্তী কাফেরদের হত্যার আদেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রেখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (তাওবাহ- ১২৩)

কাফেরদের প্রতি কঠোরতা প্রদানের আদেশ দিয়ে বলেন-

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير (التوبة(٧٣ -

হে নবী! কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফিকদের সাথে এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম এবং তা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা।( তাওবা- ৭৩)

কাফের সর্দারদের হত্যা করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন।

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الكفير

তোমরা কাফের নেতাদের হত্যা কর। (তাওবাহ- ১২)

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

তোমরা শয়তানের দোসরদের হত্যা কর। (নিসা- ৭৬)

এমনিভাবে কোথায়, কখন, কার সাথে, কিভাবে যুদ্ধ (জিহাদ) করতে হবে, তারবিশদ বর্ণনা কালামে পাকে বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনের শতাধিক স্থানে মহান আল্লাহ বান্দাকে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (জিহাদ) করার জন্য আদেশসূচক বাক্য ব্যবহৃত করছেন। এই বিধান পালনার্থে নবী করীম (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধে চার ওয়াক্ত নামায কাযা করেছেন, যা জীবনে আর কখনো অন্য কোন আমলের জন্য করেননি। যারা এ আদেশ পালনে সামান্যতমও শিথীলতা প্রদর্শন করেছেন তাদের সাথে দয়ার সাগর, রাহমাতুল্লিল আলামীন পঞ্চাশ দিন

পর্যন্ত ভয়াবহ বয়কট করেছিলেন। এমনকি সেই বয়কট থেকে কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ) এর মত জলীলুল ক্বদর বদরী সাহাবীও রেহাই পাননি, অতি বৃদ্ধ বয়সে যখন খাদেম ছাড়া চলা-ফেরা করা বড় কষ্টকর। সেই পরিস্থিতিতেও আপন স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। এ সব ঘটনার দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ-এর গুরুত্ব কত অপরিসীম।

এ ছাড়াও এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিহাদের গুরুত্ব দিতে গিয়ে তাকে জাহেলী যুগের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আমলের সাথে তুলনা করেছেন।

ইসলামের শুরু যুগে বাইতুল্লাহ শরীফের চাবি বহন, বাইতুল্লাহ শরীফে রাত্রি যাপন এবং হাজীদেরকে পানি পান করানো প্রভৃতি কাজ সর্বোত্তম আমল বলে বিবেচিত হত। আর এটা তাদের গর্বেরও কারণ ছিল।

ইসলামের সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরণের পরও অনেকের মাঝে এসব নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলছিল। একদিন হযরত তালহা বিন শায়বা (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে নিজ নিজ আমলের মর্যাদার আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা (রাঃ) বললেন, আমার যে ফযীলত, তা তোমাদের নেই। বাইতুল্লাহ শরীফের চাবি আমার হাতে। ইচ্ছে করলেই আমি বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে রাত্রি যাপন করতে পারি। হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, হাজীদের পানি সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদে হারামের সমস্ত ক্ষমতা আমার নিয়ন্ত্রণে। সব শেষে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, বুঝতে পারছিনা এগুলোর উপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হল, আমি সবার আগে বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তাদের এই আলোচনা ও বিতর্কের ফলাফল ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ و جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوْنَ عِندَ اللهِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ

তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদে হারাম আবাদ করাকে সে লোকদের (আমলের) সমান মনে কর? যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করে। এরা আল্লাহর নিকট সমান নয়।আর আল্লাহ জালেমদেরকে হেদায়েত দান করেন না। -(তাওবা: ১৯)

মুসলিম শরীফে এ আয়াতের আরেকটি প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। হযরত নোমান বিন বশীর (রাঃ) বলেন, একদা জুমু'আর দিন আমি কতিপয় সাহাবীর সাথে মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত মর্যাদাপূর্ণ আমল আর নেই এবং অন্য কোন আমল এর সমকক্ষও হতে পারে না। আর আমিও এর মোকাবেলায় অন্য কোন আমলের ধার ধারিনা। তাঁর উক্তি খন্ডন করতে গিয়ে অপর এক সাহাবী বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ (ক্বিতাল) করার মত কোন আমল নেই। এভাবে দু'জনের মাঝে বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূল (সাঃ) এর মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর! তাঁরা আলোচনা বন্ধ করে দিল। এরপর জুমুআর নামায আদায় করা হল। নামাজ শেষে তাঁরা হুজুর (সাঃ)-এর দরবারে বিষয়টি উত্থাপন করে মীমাংসা চাইলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিলের মাধ্যমে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর' জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' কে প্রাধান্য দিয়ে মতোনৈক্যের সমাধানপূর্বক চিরকালের জন্য মুজাহিদদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিলেন।

## তৃতীয় অধ্যায়

## হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব

জিহাদকে কেন্দ্র করে বর্তমান ইসলাম বিদ্বেষী ও ইসলামের দুশমনরা, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ অভিযোগ ও আক্রমনাত্মক বক্তব্য দিয়ে চলছে। তারা মুসলমানদের সন্ত্রাসী, রক্ত পিপাসু, হিংস্র বলে আখ্যায়িত করছে। অথচ ইসলামই একমাত্র ধর্ম,মুসলমানই একমাত্র জাতি যারা বিশ্বের বুকে নির্যাতিত, নিপীড়িত, উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত অসহায় মজলুম মানবতাকে অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করেছে। ধরার বুক থেকে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের চির কবর রচনা করেছে।জিহাদই একমাত্র ইবাদাত যার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে মানবতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ ও সত্যিকার জীবনধারা। ধরা পড়েছে সত্যের বৈশিষ্ট ও প্রকৃত হকের শক্তি।জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ মুসলিম জাতিকে দান করেছে দুনিয়ার আথিপত্য ও আখেরাতের চিরশান্তি নিবাস জান্নাত।যুক্তির দৃষ্টিতে তাকালেও দেখা যায় যে, কোন একব্যক্তির একটি অঙ্গে মারাত্মকভাবে ইনফেকশন হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখাহলো, যদি এ অঙ্গ না কাটা হয় হবে তা গোটা দেহে ছড়িয়ে রোগী মারা যাবে। সিদ্ধান্ত অনুপাতে সময়মত ডাক্তার অস্ত্র চালিয়ে অঙ্গটি কেটে ফেললো। এতে রোগী ভাল হয়ে উঠল। এখন এক্ষেত্রে কেউ কি বলবে? ডাক্তার এতো খারাপও সন্ত্রাসী জীবিত মানুষের তরতাজা অঙ্গটি অস্ত্র চালিয়ে কেটে ফেললো কেন? বরং সকলেই ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিবে, অভিজ্ঞ ও দক্ষতার উপাধি দিবে।ঠিক তদ্রুপ যখন কোন দেশে বা সমাজে কিছুব্যক্তি বা জামাতের কারণে বিচ্ছৃংখলা সৃষ্টি হয়। তখন মু'মিনের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় সে তাগুতের গোড়া অনুসারীকে জিহাদের হাতিয়ার দ্বারা অপারেশন করা, যাতে সমাজ ও রাষ্ট্র ফেৎনামুক্ত হয়ে যায়। ইসলামী রীতি অনুপাতে এ কাজ সম্পাদন করা মু'মিনের দায়ীত্ব ও মহান বৈশিষ্ট্য।জিহাদ ইসলামের ফরয আমলসমূহ যথা নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মর্মে ইরশাদ করেন:

الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।"

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةَ، وَذَرْوهُ سَنَامِهِ الْجِهَاد.»

-"হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সকল কিছুর মূল হল ইসলাম; আর ইসলামের স্তম্ভ (যার উপর এটি সুপ্রতিষ্ঠিত) হল নামায; আর এর সর্বোচ্চ স্থান হল জিহাদ।" -মুসনাদে আহমাদ, জামে তিরমিযী-মিশকাত

*এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানদের সম্মান ও শক্তি জিহাদের উপরই নির্ভরশীল। যখন তারা জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন তারা লাঞ্চিত ও অপমানিত হবে।

- ২عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّه.»

-হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলার রাহের মুজাহিদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির ন্যায় যে সর্বদা রোযা রাখে, নামাযে দণ্ডায়মান থাকে; আল্লাহ তাআলার কথা মানে এবং মুজাহিদ ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও রোযা ও নামায থেকে বিরতী গ্রহণ করে না।" -সহীহ বুখারী ও মুসলিম

-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْبٍ فِيهِ عين مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: لَوْ اعْتَزَلْتُ الناس، فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا ، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ، وَيُدْخِلُكُمْ الْجَنَّةَ، اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة.»

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী কোন পাহাড়ের উপত্যকায় এক ঝর্ণায় পৌঁছলেন। ঝর্ণাটি সুন্দর ও পরিষ্কার দেখে তার পছন্দ হল এবং মনে মনে ধারণা করলেন যে, ইবাদতের জন্য এ স্থানটি খুবই উপযোগী। আমি লোকালয় ছেড়ে এখানেই অবস্থান করব। অতঃপর যখন তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন তখন আপন খেয়াল তাঁরখেদমতে পেশ করলেন। তিনি ইরশাদ

করেন, "এমনটি করো না। কেননা, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদে দণ্ডায়মান হওয়া নিজ বাড়ীতে সত্তর বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম। তোমরা কি এটা কামনা কর না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করুক; তোমাদের জান্নাত দান করুক? যাও, তোমরা আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ কর। যে ব্যক্তি সামান্য সময়ের জন্যও আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" -জামে তিরমিযী

*এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হল যে, জিহাদের প্রয়োজনের সময় জিহাদ করা নির্জনে বসে ইবাদত করার চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِّنْ صَلَاتِهِ ستين سنة.

-হযরত আবু উমামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ঐ সত্তার কসম যার কুদরতী হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন! আল্লাহ তাআলার রাহ-জিহাদের ময়দানে এক সকাল বা এক বিকাল বের হওয়া সারা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তা অপেক্ষা উত্তম। আর জিহাদের কাতারে দণ্ডায়মান হওয়া বাড়ীতে ষাট বছর নামায অপেক্ষা উত্তম।"-মুসনাদে আহমাদ

-عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قفلة كغزوة.»

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "জিহাদ থেকে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করা জিহাদে যাওয়ার সমতুল্য।" -সুনানে আবু দাউদ

٦ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السيوف ». فَقَامَ رَجُل رَبِّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موسى أَنتَ سَمِعْتَ رَسُولَ ا يَقُولُ هُذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِه إلى الْعَدُوِّ ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِل.«

-হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "জান্নাতের দরজা তরবারির ছায়াতলে। একথা শোনে এক রিক্তহস্ত ব্যক্তি উঠে বলল, হে আবূ মূসা! তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা ইরশাদ করতে শোনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (আমি শোনেছি)। এই লোক ততক্ষণাত নিজের সাথীদের নিকট ফিরে আসল এবং তাদেরকে আখেরী সালাম করল। অতঃপর তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেলে দিল এবং নাঙ্গা তরবারি হাতে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুমুল যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে ধন্য হল।" -সহীহ মুসলিম

-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: شَهِيدٌ، وَعِفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيه.» ِ

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "প্রথম প্রবেশকারী তিন জান্নাতীকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। ১. আল্লাহ তাআলার রাহে শহীদ, ২. ঐ মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তি যে তালাশ ও চেষ্টা করে করে সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, ৩. ঐ গোলাম যেআল্লাহ তাআলার ইবাদতও ভালভাবে করেছে এবং স্বীয় মুনীবের খেদমতের মধ্যেও ত্রুটি করেনি।" -জামে তিরমিযী

-عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبْشِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قال: « طُولُ الْقِيَامِ. قِيْلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ: فَأَيُّ الْهِجَرَةِ أَفَضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هاجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قالَ: مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ. قِيْلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: مَنْ أَهْرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُه.»ُ

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি ইরশাদ করেন, (নফল নামাযে) সুদীর্ঘ কিয়াম। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম সদকা কোনটি? তিনি ইরশাদ করেন, যে গরীব নিজের পারিশ্রমিক থেকে খরচ করে। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম হিজরত কোনটি? তিনি ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির হিজরত ও পরিত্যাগ সর্বোত্তম, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ঐ বস্তু পরিত্যাগ করে যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি ইরশাদ করেন, যে স্বীয় জান ও মাল দ্বারা মুশরেকদের সাথে জিহাদ করে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, কোন ধরনের শাহাদাত অধিক উত্তম? তিনি ইরশাদ করেন, যে

ব্যক্তি নিজেও শহীদ হয়েছে এবং তার ঘোড়াও শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।" -সুনানে আবু দাউদ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ، أَوْ أَحَبُّ إِلى اللهِ، فَنَزَلَت. ْ

- আবু ছালেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা আলোচনা করলেন, যদি আমরা জানতাম কোন আমলটি সর্বোত্তম বা আল্লাহ তায়ালার নিকটে অধিক পছন্দনীয়! তখন অবতীর্ণ হলো:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدَوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

"হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব? যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে, তা এই যে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।"

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,
والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سريةٍ تغزو في سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وجل، والذي نفسي بيده، لَوَدِدْتُ أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل.

সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি এমন কিছু মুমিন পুরুষ না থাকত, যাদের মন রাজি হবে না যে, তারা আমার থেকে পিছিয়ে থাকবে, আবার আমার কাছে এমন কিছুও নেই, যার মাধ্যমে আমি তাদের সকলকে বাহনে চড়াতে পারি, তবে আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া কোনো সেনাদল থেকে কখনোই পিছিয়ে থাকতাম না। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কামনা করি যে, আল্লাহর পথে শহিদ হব, আবার জীবিত হব, আবার শহিদ হব, আবার জীবিত হব; এরপর আবার শহিদ হব, আবার জীবিত হব, এরপর আবার শহিদ হব। -সহিহ বুখারি, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, হাদিস নং ২৭৯৭; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ,হাদিস নং: ১৮৭৬।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

আল্লাহর পথে সকাল বা বিকেলের অল্প সময় বের হওয়া দুনিয়া ও এর মধ্যে যা আছে, সব কিছুর চেয়েও উত্তম।-সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, যা সহিহ বুখারি, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং ২৭৯২; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ,

একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে আর কি হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন এবং তার ধোঁয়া থেকেও মুক্তি পেয়ে যাবে।উল্লেখিত, সকল হাদীসই মুসলমানদের উৎসাহ প্রদানের জন্য।

মুসলমান যেন অত্যন্ত সহজ আমলের দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে নেয়। আমলটি কতই সহজ যে, জিহাদের জন্য রওয়ানা হয়ে ইচ্ছা হোক বা নাই হোক ধূলি-বালি মুজাহিদের শরীরকে আচ্ছাদিত করবেই। সে অনিচ্ছাকৃত বা অনাকাঙ্খিত ধূলা-বালির জন্যই যদি এতবড় নে'আমত তথা জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায় তবে ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ আমলের জন্য কিপরিমাণ সাওয়াব অর্জণ হবে!

আমাদের পূর্বসূরীগণ এ মাটির পূর্ণ আজমত ও যথাযথ মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই তারা যুদ্ধের সময়ে গিয়ে ইচ্ছাকৃত সে মাটি নিজের শরীরে মাখতেন, মাটির উপরই দ্বিধাহীন চিত্তে ঘুমিয়ে যেতেন।।।

## চতুর্থ অধ্যায়

## জিহাদের নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা

আমরা একটি মুসলিম দেশে বাস করছি। এর শতকরা নব্বই জনই মুসলমান। আমাদের সরকার ও শাসকগোষ্ঠীও মুসলমান হওয়ার দাবিদার। অথচ আমাদের রাষ্ট্র ও সরকার ইসলামী নয়। কেননা রাষ্ট্র ও সরকারকে ইসলামী হওয়ার জন্য তার শাসনতন্ত্র, আইন-কানুন, বিচার-আদালত, শাসনব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিকব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুই কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক পরিচালিত হতে হবে। ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার জন্য যেমন ইসলামে বিশ্বাস ও আমল প্রয়োজন ঠিক তেমনি একটি রাষ্ট্রকে ইসলামী হওয়ার জন্যও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অথচ বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক গঠিত নয়,পরিচালিতও নয়।এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রয়াস চলছে। যদিও ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী পক্ষ থেকে এ প্রয়াসকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করার আন্দোলনের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে যারা ইসলাম মানেন এবং চান, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধী নন তাদের বেশির ভাগই ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে দ্বীনি দিক থেকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের কাজটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, এর জন্য প্রচেষ্টা চালানো, আন্দোলন গড়ে তোলা এবং জিহাদ করা কতটুকু জরুরি বা আদৌ জরুরি কিনা এ নিয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে অসচেতনতা ও বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। এর অপনোদন অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যেই বর্তমান আলোচনার অবতারণা।

খেলাফত তথা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা এবং এ লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো নিছক একটি রাজনৈতিক বিষয় নয় বরং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি প্রয়োজন ও দায়িত্ব। এ দ্বীনি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া বা একে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই অথবা রাজনীতি বলে এ থেকে নিস্পৃহ থাকারও অবকাশ নেই ইসলামী শরীয়তে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে খেলাফত তথা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কেন আন্দোলন করা প্রয়োজন,কেন খেলাফত প্রতিষ্ঠার জিহাদে প্রত্যেক সচেতন মুসলমান বিশেষ করে আলেম, দ্বীনদার শ্রেণীর শরীক হওয়া এবং এ সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া জরুরি তা নিম্নোক্ত কারণ ও বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলেই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

Δদ্বীন কায়েম করা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে হেদায়েতের বিধান দিয়ে নবী-রাসূল (আ.) গণকে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষে এসেছেন পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ যে বিধান পাঠিয়েছেন তা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন নবী (আ.) গণকে। তাই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের (সা.) দায়িত্ব ছিল আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به ابرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সে নিয়ম বিধানকে নির্দিষ্ট করেছেন যার হুকুম তিনি, নুহকে দিয়েছিলেন। আর যা [হে মুহাম্মদ (সা.)] এখন তোমার প্রতি অহী প্রেরণ করেছি। আর যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম, মুসা, ঈসাকে দিয়েছিলাম যে, দ্বীন কায়েম কর এবং এতে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না। (সূরা শূরা: আয়াত ১৩)

কাজেই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ যুগে যুগে নবীগণের প্রতি এবং শেষ নবীর প্রতিও এবং তাঁর উম্মত হিসেবে আমাদের জন্যও এ নির্দেশ প্রযোজ্য। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠা মানে দ্বীনের আংশিক প্রতিষ্ঠা বুঝায় না বরং গোটা দ্বীনকেই প্রতিষ্ঠা বুঝায়। কারণ দ্বীন ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান- জীবনের সবদিক ও বিভাগই এতে নিহিত রয়েছে। কাজেই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে জীবনের সর্বস্তরেই তা করতে হবে।এখন এটা কি কেউ বলতে পারবে যে, ইসলামী রাষ্ট্র না হলে গোটা দ্বীন কায়েম করা সম্ভব? রাষ্ট্রে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, বিচার-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সমাজে, শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি ইসলাম কায়েম না করা হয়, তাহলে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েম হবে কি করে? আর রাষ্ট্র ইসলামী না হলে সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ করে রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট দিকগুলোতে যে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয় তাতো স্পষ্ট। অতএব ইকামতে দ্বীনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র একান্ত অপরিহার্য।

∆গোটা জীবনকে ইসলামের অনুবর্তী বানাতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন:

মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হওয়া, গোটা জীবনকে ইসলামের অনুবর্তী বানানো। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ দ্ব্যর্থহীন-

يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً - وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَنِ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।' (সূরা বাকারা: আয়াত ২০৮)

ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হতে হলে জীবনের যত বিভাগ আছে, স্তর আছে সব কিছুকেই ইসলামের অধীনে নিয়ে আসতে হবে। কোন অংশ যদি ইসলামের বাইরে থেকে যায় বা ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য পথ ও আদর্শের দ্বারা পরিচালিত করা হয়, তাহলে তা হবে শয়তানের অনুসরণ, ইসলামের নয়। এখন যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে বা পারিবারিকভাবে ইসলাম অনুসরণ করে চলে আর রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের আইন-কানুন, সমাজনীতি, অর্থনীতি এর বাইরে থেকে যায় তাহলে কি পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা হলো? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা ছাড়া কোনক্রমেই ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হওয়া সম্ভব নয় তাতো সুস্পষ্ট।

*অতএব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঈমানদারদের জন্য অতীব জরুরি।

∆ইসলামের অধিকাংশ বিধানই ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়:

ইসলামী শরীয়তে তথা কুরআন ও সুন্নাহয় যে সমস্ত আহকাম, বিধি-বিধান নিহিত রয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া বাকী অংশ রাষ্ট্র ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেমন চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি, নৈরাজ্য সৃষ্টি, যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, খুন-যখম, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি সম্পর্কে শরীয়তের যে বিধান রয়েছে তা ইসলামী রাষ্ট্র না হলে কি কার্যকর করা যাবে? কাফের শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও শরীয়ত মোতাবেক হক-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা কি ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব? ইসলাম যে সমস্ত অধিকার মানুষকে দিয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র না হলে কি তা প্রতিষ্ঠা করা যাবে? ইসলাম বিভিন্ন ধরনের অন্যায় ও পাপ কর্মের জন্য যে শাসন ও শাস্তির (তাযীর) ব্যবস্থা করেছে তা কি ইসলামী রাষ্ট্র না হলে প্রয়োগ করা সম্ভব? খারাজ, উশর, যাকাত, ফাই ইত্যাদি বিষয়ক শরীয়তের যে আহকাম তা কি ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব? সম্ভব নয়-একথা যদি সবাই স্বীকার করেন তাহলে কি এখন এসব বিধি-বিধান, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ মূলতবি থাকবে? নিশ্চয়ই তা কেউ বলবেন না। তাহলে এসব হুকুম-আহকামের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উপায় কি?

এ নীতি শরীয়তে সর্বসম্মতভাবে বিধিবদ্ধ- যে ফরয কাজ সম্পাদন যে সমস্ত উপায়-উপকরণের উপর নির্ভরশীল সে সমস্ত কাজ করা এবং সে সমস্ত উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করাও ফরয। যেমন নামায পড়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন জরুরি। তাই নামায যেমন ফরয ঠিক তেমনি পবিত্রতা অর্জনও ফরয। এখন রাষ্ট্র ও সরকার ছাড়া যে সমস্ত ফরয কাজ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না তা সম্পাদন করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কি ফরয হবে না? হদ-হুদুদ জারি, কিসাস প্রয়োগ, হক-ইনসাফ কায়েম যদি ফরয হয় তাহলে এসব ফরয পালনের উপায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তা প্রতিষ্ঠা করা কি ফরয নয়? অতএব আমরা যদি কুরআন-সুন্নাহর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বিচার বিভাগীয় বিধি-বিধান বাস্তবায়ন চাই, এসব কার্যকর করা ফরয মনে করি, তাহলে এর জন্য ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের কাজকেও ফরয মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

∆ ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তি জীবনেও পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম মানা সম্ভব নয়:

সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যদি ইসলাম কায়েম না থাকে তাহলে একজন ব্যক্তির পক্ষে সমাজে বাস করে ও সমাজের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যক্তি জীবনেও ইসলাম মানা সম্ভব নয়। আমরা সবাই জানি ব্যক্তিগতভাবে হালাল রুজি অনুসন্ধান করা ফরয। অথচ আজকের সমাজে হালাল রুজি সংগ্রহ যে কত কঠিন তাতো সবাই জানেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরী, অফিস-আদালত কোথাও কি শরীয়ত পুরো মানা সম্ভব হচ্ছে?সবদিক বাদ দিয়ে শুধু সুদের ব্যাপারটাই বিবেচনা করুন। চাকরি ও ব্যবসার সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক সরাসরি। ব্যাংক কি সুদভিত্তিক পরিচালিত নয়? আমরা কি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সুদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি না? অথচ সুদ গ্রহীতা, দাতা, সাক্ষী, দলিল লেখক সবাইকে হাদীসে লানত দেয়া হয়েছে। আজকের গোটা অর্থনীতিই সুদনির্ভর। জাতীয়ভাবে আমরা সুদের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। অথচ সুদ যে কত বড় পাপ তাতো কারো অজানা নয়।

অফিস-আদালতে কি ঘুষ ছাড়া আজকে সহজে কোন হক আদায় করা যায়? অথচ ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই মহাপাপী বলা হয়েছে। বিচার ফায়সালার জন্য কি আমাদেরকে মানবীয় আইনের দ্বারা পরিচালিত কোর্ট আদালতে যেতে হয় না? ফাসেক-ফাজের ও নাফরমান ব্যক্তিদের নিকট বিচার চাইতে হয় না; অথচ আল্লাহ আমাদের বলেছেন-

الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ امَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ...... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه.

'তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যারা দাবি করে যে, তোমার উপর নাযিল করা কিতাবের প্রতি তারা ঈমান এনেছে- অতঃপর বিচার-ফায়সালার জন্য তাগুতের (খোদাদ্রোহী শক্তি) নিকট নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করার? শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দূরে নিয়ে যেতে চায়।' (সূরা নিসা: আয়াত ৬০)

∆আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ছাড়া মুসলমানদের জন্য অন্য রাষ্ট্র গ্রহণযোগ্য নয়:

আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁর ছাড়া কারো সার্বভৌমত্ব নেই। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তাঁর নির্দেশ ছাড়া অন্য কারো নির্দেশ চলবে না:

انِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه

'আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম নেই।' (সূরা ইউসুফ: আয়াত ৪০)

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

'সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই, নির্দেশও হবে তাঁর।' (সূরা আরাফ: আয়াত ৫৪)

*অতএব পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। কোন রাজা-বাদশাহ, একনায়ক, পার্টি, শ্রেণী, বংশ, পার্লামেন্ট এমনকি জনগণও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়। এটা নিছক বিশেষ রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব বা মতবাদ নয়। এটা মুসলমানদের ঈমানের ব্যাপার। এখন যে রাষ্ট্র মানবীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গঠিত তাকে সানন্দে মেনে নেয়া কি ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়?

∆ আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন আইন মুসলমান দেশে চলতে পারে না:

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, মুমিনের ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় সমস্ত কাজই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইনে

সমাজ ও দেশ পরিচালনাকে পবিত্র কুরআন কুফরী, জুলুম ও ফাসেকী বলে আখ্যায়িত করেছে।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ .... هُمُ الظَّلِمُونَ هُمُ الْفُسِقُونَ

'আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, শাসন চালায় না, তারা কাফের- তারা জালেম- তারা ফাসেক।'(সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪-৪৭)

*আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আইনের ব্যাপারে মুসলমানদের এখতিয়ার থাকে না যে, পছন্দ হলে মানবো, না হলে মানবো না-হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে বলেছেন:
'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ দিচ্ছি- জামাত গঠন (সংঘবদ্ধতা),আদেশ শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও আল্লাহর পথে জিহাদ।'(তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)
*এ থেকে বুঝা গেল- মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। সংঘবদ্ধতার জন্যে তো নেতৃত্ব অপরিহার্য। নেতৃত্বের আদেশ শুনা ও মানা জরুরি। কাজেই মুসলমানদেরকে অবশ্যই এক নেতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ হতে হবে। একথা তো স্পষ্ট যে, নেতৃত্ব আনুগত্যের জন্যই। এখন যদি ইসলামী রাষ্ট্র না হয়, তার নেতৃত্ব ইসলামী না হয় তাহলে মুসলমানগণ কার আনুগত্য করবে? রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে যেহেতু মানুষ বাধ্য হয়, তাই সে রাষ্ট্র ও সরকারকে অবশ্যই ইসলামী হতে হবে। আনুগত্য করার মতো সরকার ও রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। আর এটাও স্পষ্ট যে, মুসলমানদের জন্য বর্তমান নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তাদের ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা ও যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্তব্য। এটা উম্মতের জন্য, মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব।তাছাড়া আরেকটি বিষয়ও চিন্তা করে দেখতে হবে। মুসলমানদের 'বায়আত' বা আনুগত্যের শপথকে জরুরি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার গলদেশে 'বায়আত' ছিলো না সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম শরীফ)

এখন যদি বায়আত গ্রহণ করা জরুরি হয়ে থাকে তাহলে সে ওয়াজিব পালনের জন্য কি আমরা বর্তমান ফাসেক, জালেম ও অনৈসলামী শাসকের হাতে বায়আত গ্রহণ করবো? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে কি ইসলামী ও আদেল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তার হাতে বায়আত নেয়ার জন্য সংগ্রাম করা জরুরি হয়ে পড়ে না? অবশ্যই। অতএব ইমাম নির্বাচন ও বায়আতের দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

∆ কোন ফাসেক, ফাজের ও জালেমের আনুগত্য করা সিদ্ধ নয়:

ইসলাম মুসলমানদেরকে আদেল-ন্যায়পরায়ণ তথা কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী নেতৃত্বের আনুগত্য করতে বলেছে। যারা জালেম, ফাসেক, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তাদের আনুগত্য করতে পবিত্র কুরআন বারণ করেছে:

فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

"তাদের মধ্য থেকে কোনো পাপী বা অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করো না।"(সূরা আল-ইনসান:২৪)
∆সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে:

জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমাজে বিদ্যমান অন্যায়, অবিচার ও ফিতনা-ফাসাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।আল্লাহকে ভয় করা, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর,যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।(সূরা বাকারা:১৯০)

*এই আয়াতটি জিহাদের প্রতিরক্ষামূলক প্রকৃতির উপর জোর দেয়।

*নৈতিক উন্নতি: জিহাদ শুধু বাহ্যিক সংগ্রামই নয়, বরং আত্ম-সংশোধন এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনেরও একটি প্রক্রিয়া।

* জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করা এবং এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা।

* জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধন, যা একটি ন্যায় ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভব।

*এই আয়াতটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের একটি নির্দেশিকা, যেখানে এটি বলা হয়েছে যে যারা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত, তবে সীমালঙ্ঘন করা উচিত নয়।

∆ আল্লাহর শাস্তি ও আযাব থেকে বাঁচার জন্য:

যদি ইসলামী সমাজ ওরাষ্ট্র না থাকে তাহলে প্রকাশ্যভাবেই শরীয়ত লঙ্ঘন হয় ও পাপকর্ম চলতে থাকে। জনগণ নিজেরা পাপ কাজ না করলেও শাসকদের ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পাপকর্ম ও শরীয়ত বাদ দিয়ে অন্য কোন পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনায় যদি বাধা না দেয়া হয়, এসব পরিবর্তনের চেষ্টা না করা হয়, তাহলে এর জন্য বিশেষ লোক ও সাধারণ জনগণ সবাইকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ العَامَّةَ بِعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتَّى يَرَوا الْمُنْكَرِيْنَ ظَهَرَا فِيهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يَنْكِرُوا فَلَا يَنْكِرُوا فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ عَذَبَ اللهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ কখনও বিশেষ লোকদের (অন্যায়) কাজের জন্য সাধারণ লোকদের উপর আযাব নাযিল করেন না, কিন্তু তারা (সাধারণ লোক) যদি তাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে পাপকাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পায় এবং তারা এর প্রতিবাদ করতে ও বন্ধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বন্ধ না করে তাহলে আল্লাহ তাআলা সাধারণ লোক ও বিশেষ লোক সকলকে একই আযাবে নিক্ষেপ করবেন।' (শরহে সুন্নাহ)

আর একটি হাদীসে আছে:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا

'যে জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি পাপকার্য করতে থাকে অথচ সে জাতির লোকেরা পাপ কাজ বন্ধ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা না করে আল্লাহ তাআলা তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাদের উপর কঠিন আযাব চাপিয়ে দিবেন।' (আবু দাউদ)

*ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য জিহাদ একটি অপরিহার্য বিষয়"

# পঞ্চম অধ্যায়

## জিহাদের অপব্যাখ্যা ও সঠিক ধারণা

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া এবং দীনের চিরন্তন বিধান। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং মুসলিম উম্মাহর মান-মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এর কোনও বিকল্প নেই। ইতিহাস সাক্ষী, এ বিধান উপেক্ষার ফলেই আজ মুসলিম উম্মাহ চরম লাঞ্ছনার শিকার।বর্তমানে শত্রুপক্ষ নানাভাবে এই বিধানকে নাকচ করার প্রয়াস চালাচ্ছে, যাতে মুসলিম উম্মাহর প্রতিরোধ ও পুনর্জাগরণ ব্যাহত হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অনেক বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিও কখনো অজান্তে, কখনো ভুল ব্যাখ্যার প্রভাবে জিহাদের ওপর এমন সব শর্ত আরোপ করছেন, যা মেনে নিলে বাস্তব জীবনে এ বিধান কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

জনাব ওয়াহিদুদ্দিন খান বিধর্মীদের সঙ্গে খুব সম্পর্ক বজায় রাখেন। সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলার কথা বলেন। হতে পারে এটা তার দাওয়াতি কৌশল। আল্লাহ তাআলাই তা ভালো জানেন। কিন্তু তার লেখাগুলো গভীরভাবে পড়লে এটা স্পষ্ট বুঝে আসে, খান সাহেব বুঝে কিংবা না বুঝে কুরআন ও হাদিসে গুরুত্বারোপকৃত জিহাদের বিধানকে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি জিহাদের জন্য এমন আজব আজব শর্তারোপ করেছেন, যার ভিত্তিতে মুসলিম অতীতের ঐতিহ্যময় ইতিহাস, নিকট অতীতের আকাবিরদের জিহাদ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জিহাদের বৈধতা সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। এমনকি তার শর্ত ও ভাষ্যমতে, নিকট অতীতে আমাদের আকাবিরদের জিহাদ অনুসরণীয় নয়; বরং তা ছিল অবাধ্যতা ও নির্বুদ্ধিতা। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা।

জিহাদের বিষয়ে মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খানের কিছু ভাষ্য

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাহমাতুল্লিল আলামিন হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি, যিনি যুদ্ধ ও সন্ধিচুক্তির মানবিক উসুল নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যুদ্ধ শুধু তখনই জায়িজ হবে, যখন শুধু আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করার প্রয়োজন পড়বে।' অর্থাৎ, নিজেদের পক্ষ থেকে কখনো আক্রমণাত্মক

যুদ্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। হ্যাঁ, অন্যপক্ষ আক্রমণ করলেই তবে প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা যাবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের দ্বিতীয় যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তা হলো, যুদ্ধের চেয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা সর্বাবস্থায় কাম্য ও উত্তম বিষয়। আর তাই যুদ্ধ চলাকালেও শান্তিপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি লক্ষণীয়। ফলে দ্বিতীয়পক্ষ শান্তিচুক্তিতে একমত হলে যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধি করা জরুরি। যদিও তা দ্বিতীয় পক্ষের শর্ত মেনে হোক না কেন। -(আর রিসালা: ২৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০)

২. মুমিনদের জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি শুধু তখনই, যখন শত্রুপক্ষ হামলা করবে। অর্থাৎ, কেবল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধই বৈধ। দ্বিতীয়ত, মুসলিমরা বিজয় লাভ করলে অতীতের অপরাধে কোনো বিধর্মীকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। অস্ত্র সমর্পণ করলেই সকল অপরাধ মাফ করে দিতে হবে। এরপর শাস্তির উপযোগী কেবল এমন ব্যক্তিই হবে, যে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধ করবে। কেননা, যুদ্ধের সময় হত্যা করা আর স্বাভাবিক অবস্থায় হত্যা করার বিধান এক নয়। (তাজকিরুল কুরআন: ১/৮১)

৩. এক ব্যক্তি আমাকে বলল, আপনার অনেক বিষয়ে আমরা একমত। কিন্তু আপনার এই মতাদর্শ আমার বুঝে আসে না যে, আপনি শুধু ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কথা বলেন; অথচ ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি হলো জিহাদ ও কিতাল। আপনার বক্তব্যে মনে হয় জিহাদ ও কিতাল মানসুখ হয়ে গেছে।

আমি জবাবে বললাম, আমি তো জিহাদকে মানসুখ (রহিত) বলিনি; বরং মাশরুত (শর্তযুক্ত) বলেছি। কেননা, আপনি কুরআন-হাদিসের আলোকে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, কিতাল কিছু আবশ্যিক শর্তের সঙ্গে শর্তযুক্ত। প্রথম শর্ত হলো, মুসলিমদের উচিত একতরফাভাবে বিবাদ এড়িয়ে চলে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকা এবং যতক্ষণ সবার কাছে ইসলামের পূর্ণ দাওয়াত না পৌঁছে, ততক্ষণ চুপ থাকা। ধৈর্য ধরা।

এরপরেও কাজ না হলে শত্রুদের থেকে পৃথক হতে হবে, যেটাকে হিজরত বলা হয়। যেমন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করেছেন। শত্রুদের সঙ্গে মিশ্রআবাদিতে জিহাদ হবে না।

এরপর তৃতীয় শর্ত হলো, এতটুকু শক্তি-সামর্থ্য থাকা, যার মাধ্যমে ক্ষমতা পর্যন্ত পৌঁছা যায়।

চতুর্থ শর্ত হলো, মুসলিমদের পারস্পারিক মতপার্থক্য না থাকা। কেননা, মুসলিমদের পারস্পারিক মতপার্থক্য থাকলে নবি বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও পরাজয় আসবে। যেমনটি উহুদ যুদ্ধে হয়েছে।

এরপর আমি বললাম, এসব হলো জিহাদের অপরিহার্য শর্ত। এসব শর্তের অনুপস্থিতিতে জিহাদ করলে তা নির্দিষ্ট গণ্ডির জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বলে গণ্য হবে। তা ইসলামি জিহাদ নয়। ( আর রিসালা: ২৯. আগস্ট ১৯৯)

৪. ইসলামে যুদ্ধের বিধান শুধু আত্মরক্ষামূলক। ইসলামে মৌলিকভাবে দাওয়াত হলো আসল। অর্থাৎ, শান্তি, নিরাপত্তা, হিকমত ও কৌশলে হকের কথা বলতে হবে। হকের দাওয়াত দিতে হবে। এটাই ইসলামের আমলি দাওয়াতের শুরু ও শেষ। হ্যাঁ, শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে তখন আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করা যাবে।

কিন্তু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের জন্যও আবার শর্ত হলো, এর আগে মুসলিমরা নামাজ কায়িম করবে। নামাজ কী জিনিস? নামাজ হলো একটি পূর্ণাঙ্গ দীনি প্রশিক্ষণ। নামাজের আগে মুআজ্জিন ডেকে ডেকে বলে, 'এসো কল্যাণের দিকে।' তখন মুসলিমরা কাজ ছেড়ে নামাজের দিকে ছুটে যায়। নিজেদেরকে পরিষ্কার ও পবিত্র করে নামাজে শরিক হয়। নামাজে বার বার 'আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহর বড়ত্ব ও তার বিপরীতে নিজেদের অসহায়ত্ব স্বীকার করে। সকল মুসলমান কাতারবন্দি হয়ে এক ইমামের পেছনে নামাজ পড়ে। কোনো ব্যক্তিই এদিকে-সেদিক তাকাতে পারে না। নামাজের সকল কাজ শেষে মুসল্লিরা ডানে-বামে মুখ ফিরিয়ে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে। এরপর তারা অন্যদের জন্য আল্লাহর কাছে তাদের কল্যাণ কামনায় দুআ করে।

এটাই সেই নামাজ, যা জিহাদের আগে ফরজ করা হয়েছে। মুসলিমরা যতক্ষণ এভাবে নামাজ পড়তে না পারবে, ততক্ষণ তাদের জন্য জিহাদে বের হওয়া জায়েয না। এই দীনি প্রশিক্ষণ পূর্ণ হওয়ার আগে শুধু ধৈর্য ধরতে হবে। শত্রুপক্ষ যতই জুলুম-অত্যাচার করুক, সহ্য করে যেতে হবে।

সকল মুসলিম এভাবে নামাজ পড়ার পূর্বে জিহাদ জিহাদ করা স্পষ্ট বাতিল বিষয়। এর সঙ্গে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাআলা সেই জিহাদের কথাই বলেছেন, যার আগে পূর্ণরূপে ও গুরুত্বের সঙ্গে নামাজ কায়িম করা হবে। এমতাবস্থায় নামাজ পূর্ণরূপে কায়িম হওয়ার আগে যারা জিহাদের আহ্বান করে, নিঃসন্দেহে তারা ভুলের মধ্যে রয়েছে। তারা মানুষকে এমন দীনের দিকে আহ্বান করছে, যা তারা নিজেরা দাঁড় করিয়েছে; আর যে দীন মানুষ দাঁড় করায়, তা তাদের ধ্বংস ডেকে আনে। এটা কোনোভাবেই মানুষের উন্নতি ও সফলতার মাধ্যম হতে পারে না। (আর বিসালা: ১০, জুন ১৯৮৬)

খান সাহেবের বক্তব্যের জবাব

আমরা এখানে মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খানের বক্তব্যগুলোর জবাব ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি পয়েন্টে পেশ করব।

১. শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদই কি জায়িজ?

উনিশ ও বিশ শতকের বহু পশ্চিমা লেখক ইসলামের জিহাদকে টার্গেট করেছে। জিহাদের বিধানকে কেন্দ্র করে ইসলামকে সন্ত্রাসী ও রক্তপিপাসু ধর্ম হিসেবে মানুষের সামনে পেশ করার চেষ্টা চালিয়েছে। পশ্চিমা লেখকদের ধারাবাহিক প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যা প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে কিছু মুসলিম লেখক-গবেষকও শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদের বৈধতার দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করেন। নিজেদের বানোয়াট এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সাব্যস্ত করতে তারা কুরআন-হাদিসের নুসুসের বিকৃতি করেছেন। এমনকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাজওয়াসমূহের বানোয়াট ও আশ্চর্যজনক মনগড়া ব্যাখ্যাও পেশ করেছেন।

শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু ও স্যার সাইয়িদ আহমাদের লেখায় জিহাদ শুধু আত্মরক্ষামূলক হওয়ার স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়।

তবে আলহামদুলিল্লাহ, পশ্চিমা মতাদর্শে প্রভাবিত লেখকদের জবাবে আরবি ও উর্দু ভাষায় বহু ইলমি ও গবেষণাধর্মী লেখা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছে, যেগুলোতে এই সত্য প্রমাণ করা হয়েছে, জিহাদকে শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে সীমাবদ্ধ করা কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধী। তা ছাড়া নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাজওয়াসমূহের ব্যাপারে অবগত সাধারণ পাঠকও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুল সাব্যস্ত করবে। সালাফের কাজ ও বক্তব্য এবং আমাদের নিকট

অতীতের আকাবিরদের পদক্ষেপও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুল প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এই বিকৃতি মূলত উম্মাহর ইতিহাসে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধসমূহের একটি।

ইসলামি ইতিহাসের প্রথম গাজওয়া তথা গাজওয়ায়ে বদর আত্মরক্ষামূলক ছিল না; বরং আক্রমণাত্মকই ছিল। এই আক্রমণ প্রথমে মুসলিমদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। কুরাইশের বাণিজ্যকাফেলাকে রুখতে মুসলিমরাই প্রথমে আক্রমণ চালিয়েছেন। এই খবর পেয়ে মক্কার কাফিররা তাদের কাফেলার হিফাজতের জন্য মদিনা অভিমুখে রওনা হয়। ফলে বদরযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ গাজওয়া আক্রমণাত্মকই ছিল। খুলাফায়ে রাশিদিন ও তাঁদের পরবর্তী খলিফাদের জীবনভর জিহাদও আক্রমণাত্মক প্রকারেরই ছিল। যারা শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদকেই জায়িজ মনে করে, তাদের ভাষ্যমতে ইসলামি ইতিহাসের ৯০ ভাগ যুদ্ধই জিহাদের গণ্ডি থেকে বের হয়ে ফ্যাসাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। নাউজুবিল্লাহ।

২. মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খানের আরোপকৃত শর্তসমূহের পর্যালোচনা

মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান একে তো আক্রমণাত্মক জিহাদের পক্ষে নন, আবার সেই সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক জিহাদের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, সেগুলোর অধিকাংশই তার বিকৃত মস্তিষ্কের আবিষ্কার করা। এসব অযথা শর্তসমূহকে কুরআন, সুন্নাহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহদের নুসুসসমূহে অন্বেষণ করা অনর্থক; যেগুলো ইসলামি ইতিহাসে সালাফের কোনো কিতাবেই উল্লেখ নেই।

ক. খান সাহেব জিহাদের জন্য হিজরতের শর্ত করেছেন। বড় হাস্যকর বিষয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন শর্ত অন্য কেউ করেছেন কি-না, আমার জানা নেই। খান সাহেব মিশ্র-আবাদিতে জিহাদ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন। প্রশ্ন হলো, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় বসবাসকারী গোত্র বনু কুরায়জার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য কেন মদিনা থেকে হিজরত করেননি? বনু কুরায়জার মতো ইয়াহুদিদের সঙ্গে মদিনায় থেকেই কেন যুদ্ধ করেছেন?

খ. এ ছাড়া খান সাহেব জিহাদ জায়িজ হওয়ার পূর্বে সমাজের সর্বত্র পূর্ণরূপে নামাজ বাস্তবায়ন হওয়ার শর্ত করেছেন। জিহাদের পূর্বে নামাজ বাস্তবায়ন করা জরুরি, এ শর্তের দলিল হিসেবে তিনি বলেছেন, 'জিহাদের পূর্বে নামাজ ফরজ করা হয়েছে।' এমন শর্তারোপকারীর বুঝশক্তির দৌড় কতটুকু, সেটা তাঁর দলিল পেশ করা থেকেই অনুমান করা যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যের দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করে থাকেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ.

আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা (যুদ্ধ থেকে) তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো, নিয়মিত নামাজ আদায় করো। (সুরা নিসা: ৭৭)

খান সাহেব এখানে মারাত্মক কারচুপি করে আয়াতের ক্ষুদ্রাংশ উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতের শুরুর অংশে যদিও জিহাদের পূর্বে নামাজ কায়িমের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আয়াতে শুধু নামাজই নয়; বরং নামাজের সঙ্গে সঙ্গে জাকাতের কথাও বলা হয়েছে। তাহলে খান সাহেব জিহাদের পূর্বে নামাজ কায়িমকে শর্ত করতে পারলে জাকাত আদায় ও উসুল করাকে কেন শর্ত করলেন না? অথচ নামাজ ও জাকাত দুটো একসঙ্গেই কুরআনের এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া আয়াতের শেষ অংশে জিহাদে না যাওয়াকে তিরস্কার করা হয়েছে। সেটা কেন খান সাহেব উল্লেখ করলেন না, তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না!

* নিচে মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রাহ.-এর বায়ানুল কুরআন থেকে সুরা নিসার ৭৭ নম্বর আয়াতের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি কতই-না চমৎকার ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَآتُوا الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ

مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيلًا.

হে নবি, আপনি কি তাদেরকে দেখেননি (জিহাদের বিধান নাজিল হওয়ার আগে যুদ্ধ করার এত আগ্রহ ছিল যে, থামানোর জন্য) যাদেরকে বলা হয়েছিল, '(আপাতত) তোমরা তোমাদের

হাত (যুদ্ধ থেকে) গুটিয়ে রাখো (এবং যে আদেশ তোমাদেরকে করা হয়, তাতে নিমজ্জিত থাকো, যেমন:) নিয়মিত নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও।'

(কিন্তু অবস্থা এমন ছিল যে,) যখন তাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হলো, তখন কিছু লোক যেন তেমনই (বিরোধীপক্ষের) মানুষদের (স্বভাবত এমনভাবে) ভয় করতে থাকল (যে, না-জানি শত্রুরা তাদেরকে মেরে ফেলে), যেভাবে (কেউ) আল্লাহকে ভয় করে; বরং তার থেকেও বেশি। (আল্লাহর ভয়ের চেয়ে বেশি ভয় করার দুই ব্যাখ্যা হতে পারে:

১. আল্লাহর ভয় সাধারণত আকলি বা বিবেক থেকে হয়। আর শত্রুর ভয় সাধারণ স্বভাবগত হয়ে থাকে। আর এটা স্পষ্ট বিষয় যে, বিবেকের ভয় থেকে স্বভাবগত ভয়ের পরিমাণ বাহ্যত বেশিই হয়ে থাকে।

২. দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহর ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর থেকে রহমতেরও আশা থাকে; কিন্তু শত্রুর ভয়ের মধ্যে রহমতের কোনো আশা থাকে না। ফলে এই হিসেবেও এটিকে বাহ্যিক অধিক ভয় বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ ভয় তাদের স্বভাবগত ছিল, তাই এতে কোনো গুনাহও নেই এবং (জিহাদের বিধানকে স্থগিত করার আশায়) তখন তারা বলতে লাগল (চাই মুখে বলুক কিংবা মনে মনে। আর মনের কথাও আল্লাহর কাছে জবানের মতোই), 'হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময় পালনকর্তা, আপনি এখনই আমাদের ওপর কেন যুদ্ধ ফরজ করলেন? (আপনার অনুগ্রহে) আমাদের যদি আরও কিছু সময় দিতেন। (আমরা একটু আমাদের প্রয়োজন পূরণ করে নিতাম। আর যেহেতু এই ইচ্ছা কোনো আপত্তি বা অস্বীকারবশত ছিল না, তাই এটা কোনো গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।)'

(এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের জবাবে বললেন) 'হে নবি, বলুন, এই দুনিয়ার জিনিসপত্র (ভোগবিলাস, যার জন্য তোমরা সময় চাচ্ছ) অস্থায়ী; কিন্তু পরকাল (যা অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো জিহাদ) সবচেয়ে উত্তম (কিন্তু তা) ওই ব্যক্তির জন্য, যে মুত্তাকি। (কেননা, যদি মুত্তাকি না হয়, আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে, তাহলে তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাত কিছুই নয়। আর যে ফজিলতপূর্ণ আমল পরিত্যাগ করে গুনাহ করবে, সে অতি উত্তম বিষয় থেকে বঞ্চিত হবে) এবং তোমাদের ওপর একচুলও জুলুম করা হবে না। (অর্থাৎ, যত আমল করবে, এর সম্পূর্ণ সাওয়াব পাবে। সুতরাং জিহাদের মতো ফজিলতপূর্ণ আমল থেকে কেন বিরত থাকব) (বায়ানুল কুরআন: ২/৪৭৯-৪৮০)

মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদকে জায়িজ বলার পাশাপাশি এর জন্য যেসব বানোয়াট শর্তারোপ করেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, জিহাদকে মানসুখ বা রহিত সাব্যস্ত করা এবং মুসলিমদের মনমস্তিষ্কে জিহাদের একটি সীমাবদ্ধ রূপ অঙ্কিত করা। খান সাহেবের ধারণা অনুযায়ী, পৃথিবীতে শত শত বছর ধছর ধরে জিহাদের অস্তিত্ব নেই। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহ.-এর আহ্বানে মারাঠাদের বিরুদ্ধে আহমাদ শাহ আবদালির যুদ্ধ, সাইয়িদ আহমাদ শহিদ রাহ.-এর জিহাদি আন্দোলন এবং ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে শামেলিসহ অন্যান্য ময়দানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের কোনো যুদ্ধই খান সাহেবের দৃষ্টিতে জিহাদ নয়। বরং এসব ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসাদ, বিদ্রোহ ও নির্বুদ্ধিতা। এমনকি আফগানিস্তানের জিহাদও খান সাহেবের দৃষ্টিতে জিহাদ নয়; বরং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয়তার যুদ্ধ।

মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিনের বিভিন্ন লেখা অনুযায়ী, বর্তমানে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জিহাদকে কিতালের অর্থে নেওয়ার জরুরত বাকি নেই। খান সাহেব এক হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'এই হাদিসের এদিক-সেদিকের ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে মূল দাবির দিকে লক্ষ করলে এই সারমর্ম বেরিয়ে আসে, আগামীতে এমন যুগ আসবে, যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মাধ্যমেই রাষ্ট্র জয় হয়ে যাবে। অন্য শব্দে বললে, তরবারির প্রয়োজন পড়বে না। বরং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধই মানুষকে পরাজিত করার জন্য যথেষ্ট হবে। (আর রিসালা: ১২, মে ১৯৮৮)

জনাব খান সাহেব তার ইহইয়ায়ে ইসলাম গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ-যুগের আসল কাজ এটাই, খোদাদ্রোহিতাকে দালিলিকভাবে পরাজিত করতে হবে, যাতে তাওহিদ আবার বিজয়ী হতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জানতেন, এমন একটি যুগ আসবে, যেটি হবে খোদাদ্রোহিতার যুগ। অতীতে হাজার বছরে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, যা তাওহিদের দাওয়াতের জন্য উপযোগী। এটা এখন পূর্ণ ও শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখন যদিও বাহ্যত খোদাদ্রোহিতার বিজয় মনে হচ্ছে; কিন্তু তাওহিদের দাওয়াতের সেই অবস্থা এখন এতটা পূর্ণতায় পৌঁছেছে যে, আবার মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাওহিদের বিজয় হওয়া সম্ভব। প্রথম পর্যায়ে তাওহিদের বিজয় দাওয়াতের পর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ-না ফিতনা দূর হয়...। (সূরা বাকারা:১১৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে,

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ

. বরং আমি সত্যকে নিক্ষেপ করি মিথ্যার ওপর, ফলে তা মিথ্যার মাথা চূর্ণ করে দেয়; আর হঠাৎই তা বিলীন হয়ে যায়। আর তোমাদের জন্য ধ্বংস এমনসব কারণে, যা তোমরা বর্ণনা কর। (সূরা আম্বিয়া:১৮)

কিন্তু এর পরের পর্যায় হলো, দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে বিজয় লাভ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

سَنُرِيهِمْ أَيَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد.ٌ

অচিরেই আমি তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাব, বিশ্বজগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য। এটা কি আপনার রবের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছুর ওপর সাক্ষী? (সুরা আম্বিয়া: ১৮,ইহইয়ায়ে ইসলাম, ওয়াহিদুদ্দিন খান: ১০২)

ইসলামকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তনে জিহাদ করা শুধু জায়িজই নয়; বরং মুসলিমদের কর্তব্যও বটে। এটা শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। কিন্তু এক্ষেত্রে মাওলানা খান সাহেব যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, সেটা তার পশ্চিমা দর্শনে প্রভাবিত বিকৃত মস্তিষ্কের প্রকাশ। রিসালা পত্রিকার ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় তিনি লিখেছেন, 'কিছু কিছু লোকের কাছে জিহাদ বলতে বোঝায়, বিধর্মী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ক্ষমতার চাবি ছিনিয়ে নেওয়া, যাতে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রকাঠামোর সুরতে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু এধরনের চিন্তাভাবনার সম্পর্ক না ইসলামের সঙ্গে আছে, না জিহাদের সঙ্গে। কুরআন-হাদিসের এমন একটি নসও নেই, যেখানে এধরনের আদেশ করা হয়েছে। কুরআনের ভাষ্যমতে আল্লাহর কাছে আসল হলো, মানুষের ইমান ও সৎকাজ। তবে কখনো কখনো পুরস্কারস্বরূপ মুমিনদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হতে পারে। এটা আল্লাহর কাজ; কিন্তু লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তারা নিজেদের কাজ ছেড়ে আল্লাহর কাজ করতে চাইছে...। (আর রিসালা: ২৩, জুলাই ১৯৭১)

রিসালার ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যায় জনাব খান সাহেব আরও মারাত্মক কথা লিখেছেন, 'রাষ্ট্রের ক্ষমতা যদি এমন লোকদের হাতেও থাকে, যাদের থেকে এমন আশা নেই যে, তারা অপরাধীদের শাস্তি বাস্তবায়ন করবে, তবুও মুসলিমদের জন্য ধৈর্য্য ধরা আবশ্যক। শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করাও জরুরি নয়। এই উসুল নবিজির মক্কিযুগের কর্মপন্থা থেকে সাব্যস্ত। সে-সময় মক্কার লোকেরা জনসম্মুখে মদ পান করত; কিন্তু নবিজি বা তাঁর সাহাবিরা কেউ তাদের ওপর শাস্তি প্রয়োগের চেষ্টা করেননি। শাস্তির প্রয়োগ শক্তি অর্জিত হওয়ার পরই করা হয়েছে। (আর রিসালা: ১৩, মার্চ ১৯৮৭)

শেষের বক্তব্যে খান সাহেব এমন হাস্যকর কথা বলেছেন যে, একটা অবুঝ শিশুও তার ভুল ধরতে পারবে। একথা লেখার সময় খান সাহেবের মাথা থেকে এই বিষয়টা হয়তো উবে গিয়েছিল যে, মক্কিযুগে মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো হুকুমই নাজিল হয়নি; আর মদপানের কারণে শাস্তি দেওয়া তো পরের বিষয়। মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে যত আয়াত রয়েছে, সবই মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। মদ হারাম হওয়ার স্পষ্ট বিধান সুরা মায়িদার ৯০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আর সুরা মায়িদা সম্পূর্ণই মদিনায় হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি সুরা মায়িদা সর্বশেষ অবতীর্ণ হওয়া সুরাগুলোর একটি।

হাদিস ও তাফসিরের একজন সাধারণ শিক্ষার্থীও জানেন যে, মদ হারাম হওয়ার স্পষ্ট বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের কাছে থাকা সকল মদ ফেলে দিয়েছিলেন। ফলে মদিনার অলিগলিতে বৃষ্টির পানির মতো মদ প্রবাহিত হচ্ছিল। মদের কারণে বহুদিন পর্যন্ত বৃষ্টি এলে মদিনায় মদের রঙ-গন্ধ পাওয়া যেত।

সুতরাং এই দলিল পেশ করা যে, নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম মক্কার লোকদের মদপানে বাধা দেননি, তাদেরকে শাস্তি দেননি-এটি নির্বুদ্ধিতা ও স্বল্প জ্ঞানেরই পরিচয়। খান সাহেব যদি দীনি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করতেন, তাহলে এত প্রসিদ্ধ ও একদম সাধারণ বিষয়ে এত বড় ভুল করতেন না। ফলে এত বড় ভুলও সংঘটিত হতো না।

**মোটকথা, উপরিউক্ত দুটি উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে, খান সাহেবের কাছে শরয়ি আহকাম ও শরিয়তের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তনের চেষ্টা-সাধনা করাও জায়িজ নেই। এসব উদ্ধৃতি অনুযায়ী, মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খানের কাছে রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের জন্য জিহাদ কোনো নসের আওতায় পড়ে না। অন্যদিকে তিনি তার একটি প্রবন্ধে রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা-সাধনাকে জায়িজই নয়; বরং আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন।খান সাহেব

আল ফুরকানের ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় 'দীনি দাওয়াত হিন্দুস্তান মে' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, এতে তিনি উল্লেখ করেছেন-

অনৈসলামিক রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টার বিষয়ে বলব, এটা মুসলিম রাষ্ট্রে ফরজে কিফায়ার পর্যায়ে। কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্রে আমাদের ওপর ফরজ নয় যে, আমরা ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু ফরজ না হলেও বাস্তবে একটি রাষ্ট্র যে-কোনো ফিকির ও চিন্তাচেতনা বাস্তবায়নে মৌলিক ভূমিকা রাখতে পারে। শাসকের মুসলমান হওয়া দীন ও দীনদার সকলের জন্য নানা দিক দিয়ে উপকারী। এ হিসেবে রাষ্ট্রকাঠামো ইসলাম হওয়া নিশ্চয়ই মুমিনদের জন্য পছন্দের বিষয়। আর সুযোগ হলে ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা দরকার, যাতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা যায়। এধরনের কাজে শরিক হওয়াও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এই রাস্তায় জান দেওয়া নিঃসন্দেহে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার দাবিদার। মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হলো একটি বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়। অন্যদিকে অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি নয়; বরং অবস্থার ওপর নির্ভর করে। ( আল ফুরকান: ৫২, জুলাই ১৯৬৪)

## উপসংহার

কুরআন ও হাদীস উভয়েই জিহাদকে ইসলামের একটি মৌলিক ও বহুমাত্রিক ইবাদত হিসেবে উপস্থাপন করেছে—যা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সংস্কার ও সুরক্ষার অন্যতম মাধ্যম। কুরআনের আলোকে জিহাদ কেবল যুদ্ধ বা সামরিক লড়াই নয়; বরং এটি সত্যের পক্ষে অবস্থান, নৈতিকতা রক্ষা, আত্মশুদ্ধি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং মানবতার কল্যাণ সাধনের সম্মিলিত সংগ্রাম। কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ চেষ্টা কর" ।কুরআন অত্যাচার, জুলুম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসেবে কিতালকে বৈধ করেছে, তবে কঠোর নৈতিক শর্ত, সীমা ও ন্যায়বিধানসহ।

হাদীসে জিহাদকে আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো "নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম"-কে বড় জিহাদ বলেছেন, কখনো "জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা"-কে শ্রেষ্ঠ জিহাদ ঘোষণা করেছেন, আবার কখনো মুসলিম সমাজকে রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায়—হাদীসের দৃষ্টিতে জিহাদ আত্মিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্থিক, সামাজিক এবং সামরিক—সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কুরআন ও হাদীসের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে—জিহাদ মূলত একটি শান্তিমুখী, ন্যায়ভিত্তিক ও সংস্কারমূলক জীবনব্যবস্থা, যার লক্ষ্য মানুষের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যুদ্ধ এ ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র, যা কেবল অত্যাচার প্রতিরোধ, মানবাধিকার রক্ষা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনেই বৈধ। কোনো অবস্থাতেই জিহাদ আগ্রাসন, সন্ত্রাস, জুলুম বা দমননীতির উপায় নয়।

অতএব, কুরআন ও হাদীসের আলোকে বলা যায়, জিহাদ মুসলমানের ব্যক্তিত্ব গঠন, সমাজের নৈতিক সংস্কার, মানবতার সুরক্ষা এবং সত্য-ন্যায়ের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য একটি নৈতিক ও কার্যকরী পদ্ধতি। জিহাদের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করলে স্পষ্ট হয়—এটি শান্তি, ভারসাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণের জন্য এক অবিচ্ছেদ্য ইসলামী আদ